Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 83–92
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বরাক উপত্যকার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোককথায় শিশু ও কিশোর

ড. বুবুল শর্মা
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
ই-মেইল: bubulsarma1973@gmail.com

Keyword
ইমার ঠার (মায়ের ভাষা), য়ারি (লোককথা), লোকএলা (লোকগীত), পৌরেই (প্রবাদ), লোককবিতা (ছড়া), বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, কাম্পা (পাখি বিশেষ), হিমা (মশা)

Abstract
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা ইন্দো-আর্য উপ-পরিবারের বাংলা-অসমীয়া দলের ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ। এই সম্প্রদায়ের ভাষার নাম 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী'। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা এই ভাষাকে 'ইমার ঠার' বা 'মায়ের ভাষা' বলে থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ভারতের মণিপুর রাজ্য থেকে হয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা বিভিন্ন সময়ে আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকায় ব্যাপকহারে বসতি স্থাপন করে। যার ফলে উক্ত অঞ্চলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা আলাদা একটা মান্যতা পেয়ে আসছেন। বরাক উপত্যকার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সাহিত্য। রয়েছে নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিল্পকলা, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি।
আমরা জানি একটা অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতি অধ্যয়নে 'লোককথা' এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও তার গতিপ্রকৃতি নিয়েই লোককথার পরিব্যাপ্তি। পৌরাণিক বা পুরা কাহিনি, কিংবদন্তি, উপকথা, রূপকথা, ব্রতকথা ইত্যাদি নানা ভাগেও লোককথাকে বিভক্ত করা যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় লোককথাকে বলা হয় 'য়ারি'। এই 'য়ারি'কে সাধারণত উপকথা এবং রূপকথা হিসেবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যেক ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে লোককথার প্রচলন লক্ষনীয়। লোককথা শুধুমাত্র মৌখিক সাহিত্য হিসেবে নয়, সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, কিংবদন্তি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রেই গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ জীবনে প্রচলিত বিশ্বাস- সংস্কার, সামাজিক বৈষম্য, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। লোককথার একটি অতি উল্লেখযোগ্য বিভাগ-উপকথা। উপকথা বা নীতিকথা মূলক লোককথায় পশু-পাখি ও জীব-জন্তু মানুষের মত আচরণ করে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোককথার শেষে একটা উপদেশের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। লক্ষনীয় বিষয়, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের সারৎসারই উপকথার মধ্যেই প্রকাশ পায়। শিশু-কিশোররা লোককথার বৈশিষ্ট্য খোঁজার চেষ্টা করে না বরং তার চারপাশে আপন জগৎ খুঁজে বেড়ায়। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোককথা গুলো শিশু-কিশোর মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মধ্যেই তারা বিস্ময় খুঁজে। এক নতুন তরঙ্গে আন্দোলিত হতে থাকে তাদের মন, গল্পের শ্রোতারা অনায়েসেই এগিয়ে যায় কাল্পনিক জগতে। এখানেই শিশুরা কৌতুহলী শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। আমরা জানি, লোককথা 'লোকমন' থেকেই উদ্বুদ্ধ তাই, লোককথায় মানব মনের নানা ইচ্ছা, নানা অধরা বস্তুকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। লোককথা মানব জীবনের দলিল। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, বিশ্বাস-সংস্কারের চিত্রপট

গুলি লোককথায় চিত্রিত হয়েছে।

Discussion

১

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা মূলত 'ককেশয়েড' মহাজাতির ইন্দো-আর্য উপ-পরিবারের বাংলা-অসমীয়া দলের ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ। কিন্তু এই বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এই সম্প্রদায়ের ভাষার নাম 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী'। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা এই ভাষাকে 'ইমার ঠার' বা 'মায়ের ভাষা' বলে থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ভারতের মণিপুর রাজ্য থেকে হয়েছিল। ১৮১৯ - ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের সময়ে মণিপুর রাজ্যে বার্মিজরা আক্রমণ চালায়। সেই যুদ্ধ সাত বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল যার ফলে, মণিপুরের অন্যান্য জাতি এবং উপজাতির ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরাও তদানীন্তন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ছাড়াও বাংলাদেশ, বার্মা (মিয়ানমার) সহ বেশ কয়েকটি দেশে এই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা বসবাস করে।

ভারতের অন্যান্য ভাষার মতোই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর মূল শব্দ ভান্ডার গঠিত হয়েছে তদ্ভব শব্দ গুলি থেকে। তাছাড়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় অন্যান্য ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যেমন- তৎসম, বাংলা, মৈতৈ, তদ্ভব, আরবি-ফারসি, ইংরেজি, দেশি শব্দ, অর্ধ তৎসম শব্দ। ব্রিটিশ আগমনের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লেখকরা বাংলা-অসমীয়া লিপির ব্যবহার শুরু করেছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা বিভিন্ন সময়ে আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকায় ব্যাপকহারে বসতি স্থাপন করেন। যার ফলে উক্ত অঞ্চলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা আলাদা একটা মান্যতা পেয়ে আসছেন। লক্ষণীয় বিষয়, বরাক উপত্যকায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মাতৃভাষার দাবিতে আন্দোলন করেন, সেই আন্দোলনে শহীদ হন সুদেষ্ণা সিংহ নামে এক তরুণী, তাছাড়া সেই আন্দোলনে অনেকে আহত হন। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৯৯ সালের ৯ এপ্রিল গৌহাটি হাইকোর্টের রায়ে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' জনগোষ্ঠীর নাম ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর ২০০৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের এক যুগান্তকারী রায়ের মাধ্যমে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যের একটি পরিষদ গঠিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। বস্তুত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যের ইতিহাস শুরু হয়েছিল জাগরণ (জাগারন) নামে একটি সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমে ১৯২৫ সালে। পত্রিকাটি বাংলাদেশের শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, সম্পাদক ছিলেন শ্রী মহেন্দ্র কুমার সিংহ। তাছাড়া ১৯৩৩ সালে বরাক উপত্যকায় আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। সমিতির নাম 'সুরমা ভ্যালি মণিপুরী সোসাইটি'। 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের প্রাচীন সাহিত্য ভান্ডার রয়েছে। বরন ডহানির এলা (বৃষ্টি ডাকার গান/১৪৫০-১৫০০), মাদই সরাহান এলা (বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোকগান/১৬০০-১৭০০), খাম্বাথৈবীর প্রেম কাহিনী/ ১৫০০-১৬০০)। অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি কামনায় ঐতিহ্যবাহী 'বরন ডহানির এলা' এই গান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নারীরা খোলা আকাশের নীচে পরিবেশন করে থাকেন'। (সুধন্য সিংহ) বর্তমান সময়ে এই ভাষায় প্রচুর সাহিত্যের নিদর্শন আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোক সাহিত্যের অন্যতম ঐতিহ্য হচ্ছে মৌখিক সাহিত্য। লোক কথা,লোকগীত, ছড়া, কবিতা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি নিয়েও বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তি চর্চা শুরু করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোকসাহিত্যের চারটি প্রধানভাগ। য়ারি (লোককথা), লোকএলা (লোকগীত), পৌরেই (প্রবাদ), লোককবিতা (ছড়া)। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মৌখিক সাহিত্যে শিশু মনস্তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ছড়া এবং লোককথা। আমাদের আলোচনার বিষয় 'বরাক উপত্যকার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোককথায় শিশু ও কিশোর'।

২

লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ এবং উল্লেখযোগ্য শাখা হল 'লোককথা'। সমগ্র বিশ্বে লোককথার এক সুবিশাল ঐতিহ্য বর্তমান।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য আসাম। আসাম রাজ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদে ভরপুর। সমৃদ্ধ এই রাজ্য তিনটি উপত্যকায় বিভক্ত। ক) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা- ২৮টি জেলা, খ) বরাক উপত্যকা- ৩টি জেলা, গ) পার্বত্য উপত্যকা- ২টি জেলা নিয়ে গঠিত এই রাজ্য। আসামের বরাক উপত্যকার অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙালি। তাছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতি এবং হিন্দিভাষী চা জনগোষ্ঠীর মানুষরা বসবাস করে আসছে। সামাজিক-রাজনৈতিক-ভৌগোলিক প্রভৃতি নানা কারণে বিভিন্ন সময়ে নানা জনগোষ্ঠীর মানুষ এখানে এসে বসবাস স্থাপন করেছে। বরাক উপত্যকার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সাহিত্য। রয়েছে নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিল্পকলা, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি।

আমরা জানি একটা অঞ্চলের সমাজ- সংস্কৃতি অধ্যয়নে 'লোককথা' এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লোকসাহিত্যে সমাজ জীবনের নানা চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটে। সাহিত্যের মূল উৎস লোকসমাজ। এই লোকসমাজের 'লোক' শব্দটি নানা অর্থবাচক।

> "একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ড (গ্রামে, গঞ্জে, মহকুমায়, জেলায় বা রাজ্যে, রাষ্ট্রে) বসবাসকারী সমভাষী সরল ঐতিহ্যবাহী জনসমাজকে বলা হয় লোকসমাজ।"[১]

অর্থাৎ লোক'দের দ্বারা গঠিত সমাজই লোকসমাজ বলে চিহ্নিত, এবং লোক'দের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্যই লোকসাহিত্য, যাকে আমরা 'মৌখিক সাহিত্য' বা 'গ্রাম্য সাহিত্য' নামে অভিহিত করে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে,

> "বিশেষ প্রয়োজনে ও সৃষ্টির আনন্দে গোষ্ঠীসমাজ প্রাথমিক অবস্থায় যে মৌখিক সাহিত্যের জন্ম দেয়, তাই ব্যাপক অর্থে লোকসাহিত্য বলে সুপরিচিত।"[২]

বস্তুতঃ পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা ও সাহিত্যের পেছনে আছে এক সুদুরপ্রসারী লোক ঐতিহ্য। লোকসাহিত্যের প্রধান কয়েকটি বিভাগ-লোককথা, লোকসংগীত, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, গীতিকা, লোকনাট্য ইত্যাদির মধ্যে একমাত্র গদ্যরূপ হলো লোককথা। সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ বাস্তব, অবাস্তব, নানা কল্পনায় অসংখ্য গল্প রচনা করেছে। ছোট-বড় সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে এই গল্প কাহিনি ছিল আনন্দের বাড়তি রসদ। এই গল্প কাহিনির মধ্যে রয়েছে বিশেষ জীবনীশক্তি।

> "প্রাগৈতিহাসিক যুগের অ-সভ্য সমাজে উদ্ভূত আদিম বিশ্বাসের কাহিনী থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত যে ঐতিহ্যিক প্রবহমান কাহিনীর স্রোত - কথাসরিৎসাগর, আরব্য রজনী এবং সর্ববিধ পুরাকাহিনি- রূপকথা-উপকথা-পশুকথা প্রভৃতিকে বহন করে চলেছে তাকেই লোককথা নামে চিহ্নিত করা হয়।"[৩]

বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও তার গতিপ্রকৃতি নিয়েই লোকথার পরিব্যাপ্তি। পৌরাণিক বা পুরা কাহিনি, কিংবদন্তি, উপকথা, রূপকথা, ব্রতকথা ইত্যাদি নানা ভাগেও লোককথাকে বিভক্ত করা যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় লোককথাকে বলা হয় 'য়ারি'। এই 'য়ারিকে সাধারণত উপকথা এবং রূপকথা হিসেবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এবারে নিম্নে সাতটি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোককথা মান্য চলিত বাংলায় তুলে ধরা হলো। (লোককথা গুলি আমি যুক্ত সুধন্য সিংহ মহাশয়ের কাছ থেকে (১নং থেকে ৫নং), বিনিন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কাছ থেকে ৬নং এবং বিধান সিংহ মহাশয়ের কাছ থেকে ৭নং গল্পটি সংগ্রহ করেছি)

১. টপ্পা আর কাম্পা :

এক যে ছিল টপ্পা আর কাম্পা, তারা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কাম্পা একটি পাখি আর টপ্পা হলো বন বিড়াল। প্রত্যেকদিন

তারা দুজনেই যেকোনো অবস্থাতেই দেখা করে। একজন আরেকজনের সাথে দেখা না হলে তারা থাকতে পারে না। গাছের উপর বাসা করে থাকে কাম্পা, আর জঙ্গলের ঝুপের মধ্যে গর্ত করে থাকে টপ্পা। কাম্পা প্রত্যেকদিনই একবার করে উড়ে গিয়ে বন্ধুর সাথে দেখা করে আসে। আজ অনেকদিন হলো কাম্পা আর বন্ধুর সাথে দেখা করে না। টপ্পা চিন্তা করে বন্ধুর কি হলো। বন্ধুর খোঁজ নেওয়ার জন্য টপ্পা বন্ধুর বাসায় যায়, গিয়ে দেখে বন্ধুর দুটি বাচ্চা হয়েছে। তখন বাচ্চা দুটি খাওয়ার জন্য লোভ হয় টপ্পার। বন্ধুর সন্তান ভেবে সে চলে যায়।

পরের দিন টপ্পা মুখে চুন কালি লাগিয়ে গ্যের-গ্যোর শব্দ করে গাছে উঠে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে, কী করো বন্ধু? আমাকে কিরকম লাগছে। কাম্পা বুঝতে পারে বন্ধুর দুরভিসন্ধির কথা। তখন কাম্পা বুদ্ধি করে বন্ধুকে বলে, এই সংসারের মধ্যে তুমিই সেরা সুন্দর। টপ্পা খুশি হয়ে গাছ থেকে নেমে চলে যায়। টপ্পা চেয়েছিল বন্ধুকে রাগাতে, তাহলেই তার উদ্দেশ্য সফল হবে। পরের দিন আবার টপ্পা গ্যের-গ্যোর শব্দ করে গাছে উঠে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে, কী করো বন্ধু? তোমার সাথে আমার অনেক দিনের পরিচয়, বলো আমাকে কিরকম লাগছে? কাম্পা পুনরায় বন্ধুর প্রশংসা করে একই কথাই বলে। টপ্পা খুশি হয়ে গাছ থেকে নেমে চলে যায়।

এইভাবে অনেক দিন চলল, টপ্পা আর কাম্পার বাচ্চা দুটি খাবার কোন সুযোগ'ই পায় না। টপ্পা প্রত্যেকদিনই কম্পার বাসায় যায় সুযোগের সন্ধানে। একদিন টপ্পা মুখে চুন কালি লাগিয়ে গ্যের-গ্যোর শব্দ করে গাছে উঠে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে, কী করো বন্ধু? আমাকে কিরকম লাগছে। টপ্পার বারেবারে জিজ্ঞেস করার পরও কাম্পা কোন উত্তর দিল না। আবার যখন টপ্পা বলে, কী করো বন্ধু? আমাকে কিরকম লাগছে। তখন কাম্পা অত্যন্ত রাগান্বিত স্বরে বলে, কি হয়েছে এত চিৎকার চেচামেচি কিসের। প্রত্যেক দিনই তো একই কথা বলছ। তুমাকে এতই খারাপ লাগছে যে, তোমার মুখে থুথু ফেলতেও ঘেন্না করে। কম্পার কথা শুনে টপ্পা উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ভেবে তার ঘরে ঢুকে। আসলে টপ্পা বন্ধুকে রাগাতে চেয়েছে কারণ, রাগ করে বন্ধু তাকে খারাপ কথা বললেই সে বাচ্চাদুটি খেতে পারবে।

বাচ্চা দুটির বড় হওয়ার অপেক্ষায়ই কাম্পা অনেকদিন ধরে প্রশংসা বাক্য প্রয়োগ করে বন্ধুকে খুশি রেখেছে। এখন তার বাচ্চা দুটি বড় হয়েছে উড়তেও পারে। তাই সে দুষ্ট বন্ধুকে বলেছে, তোমাকে খুব বিশ্রী লাগছে। টপ্পা রাগ করে কাম্পার ঘরে ঢুকে বাচ্চা দুটির উদ্দেশ্যে বলে, এবার আমি তোমাদেরকে খাব। তখন বাচ্চা দুটি বলে, জ্যেঠামশাই তোমাকে কষ্ট করতে হবে না তুমি মুখ 'হাঁ' করে থাকো, আমরা তোমার পেটের মধ্যে ঢুকে যাব। টপ্পা ভাবল, বাচ্চা দুটি তার কবল থেকে যেতে পারবেনা। তাই মুখটা হাঁ করে সে বসে থাকল। বাচ্চা দুটি মুখে ঢুকে হাগু করে উড়ে চলে যায়। সে বুঝতে পারেনি বাচ্চারা উড়া শিখে গেছে। তখন কাম্পা আফসোস করে বলল, বাচ্চা দুটির হাগু যদি এত স্বাদ হয় তাহলে, ওদের মাংস খেতে কতই না সুস্বাদু হতো।

২. আকাশ :

অনেক আগের দিনের কথা, তখন আকাশটা ছিল আমাদের খুব কাছে। একদিন গ্রামের এক মহিলা ধান বানতে শুরু করেছে। তার খুব তাড়া ছিল। তাই তাড়াহুড়ো করে ধান বানতে গিয়ে বারে বারে ছিয়ার উপরের দিকটা আকাশে ধাক্কা লাগে। বারবার আকাশে ধাক্কা লাগার কারণে মহিলাটির ধান বানতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তখন মহিলাটি রাগ করে, ঝাড়ু দিয়ে আকাশকে আঘাত করে বলে, বারবার ধাক্কা লাগছে, তুমি কি বুঝতে পারছ না। তখনই ফু-উ-উ-উ শব্দ করে আকাশ খুব দুঃখ করে উপরে উঠে যায়। একদিন আকাশ খুব দুঃখ করে বলে, নিচে থাকতে আমি কত সুখে ছিলাম আর এখন আমাকে উপরে থাকতে হচ্ছে। তাই মনের দুঃখে আকাশ যখন কান্না করে তখন পৃথিবীতে বৃষ্টি হয়।

৩. ধানের খোসা :

এক যে ছিল ভিখারি। সে ভিক্ষা করত গ্রামে গ্রামে। একদিন ভিক্ষা করতে বের হয়ে সারাদিনেও সে তেমন কিছুই পাইনি তাই, মনের দুঃখে সে বাড়ি রওয়ানা দেয়। সময়টা ছিল অগ্রহায়ণ মাস। বাড়ি যাওয়ার সময় সে দেখে মাঠ ভর্তি পাকা ধান। তখনকার সময়ে ধানের কোন খোসা ছিল না, সরাসরিই গাছে চাল ধরতো। পাকা ধানের মাঠের আল দিয়ে

যাওয়ার সময় ভিখারি ভাবল, কি দরকার ভিক্ষা করার? গাছে গাছে এত চাল ধরে আছে। তখন সে চালের শীষ গুলো টেনে টেনে তুলে ব্যাগভর্তি করে বাড়ি চলে যায়। ভিখারীর এই কর্মকান্ড দেখে লক্ষ্মী মা মনে খুব কষ্ট পেলেন। তাই, মনের দুঃখে তিনি চালের উপর খোসা দিয়ে দিলেন। এভাবেই চালের উপর খোসার সৃষ্টি হয়ে ধানের রূপলাভ করে।

৪. হিমা (মশা) :

অনেক দিন আগের কথা, এক যে ছিল পুরুষ মশা ও তার স্ত্রী। তাদের কোন সন্তান ছিল না। মনের দুঃখে তাদের দিন এভাবেই চলে যায়। বৃদ্ধ বয়সে তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। স্বামী স্ত্রী মিলে সন্তানকে খুব আদর যত্ন করে বড় করে তোলেন। একদিন অন্যান্য সঙ্গী সাথীর সাথে খেলাতে যাবার জন্য মা-বাবার কাছে অনুরোধ করে পুত্র। তখন পিতা মাতা পুত্রকে বলেছেন, খেলা করো আপত্তি নেই। সবসময় বন্ধুদের সাথে থাকবে। একা কোথাও যাবেনা। সন্ধ্যার আগেই বাড়িতে এসে যাবে। আর যদি খেলতে খেলতে খুব বেশি ক্ষুধা লেগে যায়, তাহলে কোন মানুষের শরীরের রক্ত খাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করবে না। চিন্তা করে মানুষের পিঠে বসবে। মানুষের হাতে-পায়ে মুখে কোনো অবস্থাতেই নয়। সন্তান বন্ধুদের সাথে খেলতে চলে যায়। তারা একটি গোবরের ঢেলার উপর খেলতে খেলতেই সন্ধ্যা নেমে আসে। সবাই বাড়ি রওয়ানা হয়ে যায়। অন্যদিকে মশার ছেলের খুব ক্ষুধা লাগে। ক্ষুধার তাড়নায় মা-বাবার উপদেশের কথা ভুলে, রাস্তায় একটি মানুষের হাতের মধ্যে বসে রক্ত খেতে। মানুষটি এক থাবাতেই তাকে মেরে ফেলে। অন্যদিকে বৃদ্ধ মা-বাবা পুত্রের অপেক্ষায় বসে আছেন। তারা পুত্রের বন্ধুদের সাথে কথা বলে জানতে পারেন, তাদের সন্তান ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের হাতে বসেছে রক্ত খাওয়ার জন্য। মা-বাবা বুঝতে পারলেন তাদের সন্তান আর আসবেনা।

৫. বাঁশের পাতা আর মাটির ঢেলা :

বাঁশের পাতা আর মাটির ঢেলার মধ্যে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তাদের মধ্যে এমনি বন্ধুত্ব যে, যদি ঝড় আসে তাহলে, মাটির ঢেলা বাঁশের পাতার উপর বসে তাকে ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করে, আর যদি বৃষ্টি নামে তাহলে বাঁশের পাতা মাটির ঢেলার উপর বসে তাকে রক্ষা করে। এমন'ই তাদের বন্ধুত্ব। একদিন প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি এসেছে, তখন মাটির ঢেলা বাসের পাতার উপর বসে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁশের পাতা মাটির ঢেলাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচন্ড বৃষ্টি মাটির ঢেলাকে গলিয়ে দিল। তখন ঝড় বাঁশের পাতাকে কোথায় যে উড়িয়ে নিয়ে গেল। দুই বন্ধুর মধ্যে চিরদিনের বিচ্ছেদ হয়ে গেল ঝড়ের সাথে বৃষ্টির আগমনে।

৬. মানুষের সৃষ্টি :

এক যে ছিল হংস আর হংসিনী। তাদের খুব সুন্দর সংসার। মনের আনন্দে পুকুরের জলে সাঁতার কাটে। খায়-দায় ঘুমায়। এইভাবে আনন্দের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। একদিন হংসিনী দুটো ডিম পাড়ে। তারপর হংসিনী সেই ডিমে তা' দিতে শুরু করে। অন্যদিকে হংস খাদ্য সংগ্রহ করে এনে হংসিনীকে খেতে দেয়। এই ভাবে দিনের পর দিন যায়, একদিন সেই ডিম ফুটে বের হল দুটো মানুষের বাচ্চা। মানুষের বাচ্চা দেখে হংস আর হংসিনী অবাক হয়ে গেল। কি করবে তারা কোনো কিছুই ভেবে পাচ্ছে না, অন্যদিকে বাচ্চা দুটো অনবরত কান্নাই করে চলেছে। তাই নিরুপায় হয়ে ওরা ঈশ্বরের শ্মরণাপন্ন হলো। ঈশ্বর তাদেরকে বললেন, ওরা ক্ষুধার্ত ওদের খাদ্যের প্রয়োজন। তখন হংস আর হংসিনী বলল, হে ঈশ্বর আমরা যা খাই ওরা তো তা খাবে না। ঈশ্বর তখন আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমরা যা খাও সেই খাদ্যের রস তুলা দিয়ে চুবিয়ে তুলার মধ্যে থাকা রস ওদেরকে চুষে খাওয়াবে। এই বলে ঈশ্বর অন্তর্ধান হলেন।

হংস আর হংসিনী ঈশ্বরের কথা মত খাদ্যের রসে তূলা ভিজিয়ে তোলার রস বাচ্চা দু'টোকে চুষে খাওয়াতে লাগল। এই ভাবে দিন যায় মাস যায়, বাচ্চা দু'টো আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো। বাচ্চা দুটো বড় হওয়ার ফলে হংস

আর হংসিনীর চিন্তাও বেড়ে গেল। ওদেরকে কোথায় নিয়ে রাখা যাবে, ওদের তো একটা বাসস্থানের প্রয়োজন। আবার হংস আর হংসিনী নিরুপায় হয়ে ঈশ্বরের শ্মরণাপন্ন হলো। ঈশ্বর এসে বললেন, তোমরা দুজন উড়ে গিয়ে ওদের থাকার জন্য সুন্দর একটা জায়গা দেখে আসো। ঈশ্বরের কথা মত হংস আর হংসিনী উড়ে গিয়ে একটা জায়গা দেখে ওদের খুব পছন্দ হল। সেই জায়গার নাম, 'হিহিড়ি-পিপিড়ি' পর্বত। ঈশ্বর তখন বললেন, তোমরা যেহেতু পছন্দ করে এসেছ, সেই জায়গাতেই মানুষের বাচ্চা দু'টোকে রেখে আসো। তখন হংস আর হংসিনী দুজনের পিঠে দুজন মানুষের বাচ্চাকে উড়িয়ে নিয়ে 'হিহিড়ি-পিপিড়ি' পর্বতে রেখে আসে। সেই পর্বতেই মানুষের বাচ্চা দুটো সেই দিন থেকেই সেখানে থাকে। তারপর হংস আর হংসিনী কোথায় যে উড়ে চলে গেল তাদের দেখা আর কেউ পেল না।

৭. আয়না না থাকা একটি গ্রামের কাহিনি :

কোন এক সময়ে 'সিংগের হাওরে' প্রচুর মাছ বের হয়েছে। ঘরে ঘরে প্রচুর জিওল মাছ। বিরাট বিরাট পাত্রে মাছগুলোকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। জিওল মাছের মধ্যে 'শিং' মাছের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল। সম্ভবত শিং মাছ বেশি থাকার কারণেই সেই হাওরের নাম 'সিংগের হাওর' হয়েছে।

আজকে আমি যে গল্পটা বলবো সেটা বহুদিনের পুরনো গল্প। সেই সময় তোমাদের জন্ম হয়নি। আজকের মত তখনকার দিনে রাস্তাঘাট এত ভাল ছিলনা। একদিন 'হুনাধন দাদু' চাঁপা, খালুই, সেঁউতি এবং মাথায় দেওয়ার জন্য ছাতা নিয়ে মাছ ধরতে গেছেন সিংগের হাওরে। প্রচণ্ড রৌদ্রে হুনাধন দাদু অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। উনার মাথায় দেওয়ার ছাতা চ্যাপ্টা হয়ে যায়। অন্য মৎস্যশিকারীরা যখন দেখলেন, হুনাধন দাদু অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেছেন তখন তারা, তাড়াতাড়ি দাদুকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে যায় দাদুর অচৈতন্য হওয়ার খবর।

এই সংবাদ শুনেই গ্রামের সবাই এলো হুনাধন দাদুকে দেখতে। তখন একজন কবিরাজ বললেন, উনাকে মেকার ভূত ধরেছে। এই কথা শুনে আরেকজন বললেন, না না উনার বদহজম হয়েছে। অন্য আরেকজন বললেন, খুব সম্ভবত উনাকে হাওরের পরী ধরেছে। এইভাবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্তব্য করতে লাগলেন। এরই মধ্যে যে যেরকম পারে সেই রকমই কবজ-তাবিজ, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি নানা কবিরাজি এবং বুজরুকি বিদ্যার প্রয়োগ করতে লাগলেন হুনাধন দাদুর উপর। সমস্ত ধরনের কবিরাজি এবং বুজরুকি বিদ্যার প্রয়োগেও দাদুকে বাঁচানো গেল না।

দাদুর মৃত্যুর পর শুরু হল আরেক অধ্যায়। কোন দলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে দাহ করা হবে এই নিয়ে জোর তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। তখন চেংকুরি দলের একজন মুখিয়া বললেন, তিনি আমাদের দলের। অতএব আমাদের মত করেই উনার দাহকার্য সম্পন্ন হবে। অন্য আরেকজন মুখিয়া পাঁচ পরগনার, তিনি বললেন আমাদের মতো করেই হবে। গাগরা পন্থী আরেকজন বলে উঠলেন, না আমাদের মতো করেই হবে। এইভাবে মৃত ব্যক্তিকে উঠানে শায়িত রেখে বিভিন্ন দলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। তারপর, কোনরকমে এই ঝগড়াকে নিষ্কৃতি দিয়ে দুপুরের মৃত ব্যক্তির দাহকার্য সম্পন্ন হল সন্ধ্যার সময়। অতঃপর বিভিন্ন দলের ঝগড়ার মধ্যেই তৃতীয় দিনের 'পরক' পর্ব সমাপ্ত হল। তারপর পঞ্চমদিনে 'অস্থিচন্দন' বা 'অস্থিসঞ্চারে'র ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দলের মধ্যে ভিন্নমত দেখা দিয়েছে। তারপর শ্রাদ্ধের ব্যাপারেও শুরু হলো ঝগড়া। তখন নির্দল শুভাকাঙ্খীরা বলল, আমরা কোনো দলের নই, দাদুর শ্রাদ্ধক্রিয়া আমাদের মত করেই হবে।

পিতৃ শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য পুত্র ব্রজধন জীবনে প্রথম কোনো বড় বাজারে গিয়ে একটি দোকানের মধ্যে ঢুকলো। দোকানে ঢুকে ব্রজধন দেখল তার বাবা এই দোকানের কর্মচারী। সে অবাক হয়ে গেল। তাহলে তার বাবা মারা যান নি। ব্রজধন কান্না শুরু করে দিল। তার দেখাদেখি ব্রজধনের পিতাও কান্না শুরু করে দিলেন। দোকানি 'কিরাধারী' এই ব্যক্তিকে দেখে বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই ওই ব্যক্তির নিকট আত্মীয় কেউ মারা গেছেন। ব্রজধন দোকানিকে বলল, আমার বাবাকে ছেড়ে দিন, আমার বাবা আপনার এখানে কয়েদ হয়ে আছেন, আমি আমার বাবাকে নিয়ে যাব। ব্রজধন শ্রাদ্ধের জিনিস পত্র কিনা ছেড়ে দিয়ে, আয়নার মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবিকে নিজের বাবা ভেবে সেটা কিনে নিতে

চেয়েছে। অতঃপর ব্রজধন টাকা দিয়ে সেই আয়না কিনে কাপড় দিয়ে মোড়ে ঘরে নিয়ে আসে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সেই সময় গ্রামের রাস্তায় কোনো মানুষ ছিলনা। তাই কেউ দেখেনি ব্রজধন কি নিয়ে আসছে?

ব্রজধন বাড়িতে এসেই স্ত্রীকে বলল, বাবার জন্য বিছানা করো, আমি বাবাকে নিয়ে এসেছি। স্ত্রী বিছানা করল বাবাকে শোয়ানো হলো। এবার ব্রজধন স্ত্রীকে বলল, বাবার আসার সংবাদটা আমি কাকাকে দিয়ে আসি। যাবার সময় এসে বলে গেল বাবাকে ডিস্টার্ব করবে না, বাবার যাতে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়। স্বামী যাওয়ার পর স্ত্রী চুপিচুপি কুপিবাতি নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে নিজের প্রতিচ্ছবি আয়নার মধ্যে দেখে, উচ্চস্বরে সে বলতে লাগল, আমার কপাল পুড়ে গেল। বাবার এখনো শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি,আমার স্বামী আরেকটি বউ নিয়ে এসেছে। বউয়ের এই কথা শুনে ব্রজধনের পিসিমা বললেন, আমার ভাইপো এরকম নয়। এই বলে বৃদ্ধ পিসিমা কুপিবাতি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে বললেন, 'হায়রে কপাল পুড়া, আর বউ তুই পাসনি বুড়া একটা বেটি তুই বিয়ে করে নিয়ে এসেছিস'। এভাবে বৃদ্ধা গালাগালি করতে লাগলেন। ইত্যবসরে বাড়ির একটি ছোট মেয়ে গিয়ে দেখে, ঘরের ভিতর একটি ছোট মেয়ে। সে তখন আনন্দে নাচতে নাচতে বলতে লাগলো, কাকা আমার মতো একটি মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছেন। আমার খুব ভারী মজা লাগছে আমি ওর সাথে খেলা করব।

তখন ব্রজধনের গৃহে একজন কান্না করছে, একজন গালি দিচ্ছে, একজন আনন্দে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। এভাবে হল্লা-চিৎকার শুনে কয়েকজন যুবক তাদের বাড়িতে আসে। সব কথা শুনে তারা ঘরে ঢুকে দেখে, ব্রজধন পিতার শ্রাদ্ধের কাজের সুবিধার জন্য কয়েকজন যুবককে ঘরের মধ্যে এনে রেখেছে। এইভাবে একটা হুলুস্থুল পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে যায় ব্রজধনের গৃহে। সেই সময় সেই রাস্তা দিয়ে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন একটি আয়নাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে গন্ডগোল। তিনি সবাইকে বললেন, এই বস্তুর নাম আয়না। আয়নাতে নিজের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়।

৩

প্রত্যেক ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে লোককথার প্রচলন লক্ষনীয়। লোককথা শুধুমাত্র মৌখিক সাহিত্য হিসেবে নয়, সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, কিংবদন্তি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রেই গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ জীবনে প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কার, সামাজিক বৈষম্য, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। লোককথার একটি অতি উল্লেখযোগ্য বিভাগ- উপকথা। উপকথা বা নীতিকথা মূলক লোককথায় পশু-পাখি ও জীব-জন্তু মানুষের মত আচরণ করে। আসলে এই আচরণ মানুষেরই রূপক। বস্তুতঃ পশু-পাখি ও নানা জীব-জন্তুকে কেন্দ্র করে যে লোককথার সৃষ্টি হয় তাতে, বাঘ, সিংহ, হরিণ, টুনটুনি পাখি, চড়ুই পাখি, মাছ, কাঁকড়া, কাক, বিড়াল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। উপকথা বা নীতিমূলক লোককথার শেষে একটা উপদেশ পাওয়া যায়। লক্ষনীয় বিষয়, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের সারৎসার উপকথার মধ্যেই প্রকাশ পায়।

দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। 'টপ্পা আর কাম্পা' গল্পে লক্ষ করতে পারি, টপ্পা আর কাম্পার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। টপ্পা কাম্পার নবজাতক শিশু দুটিকে খেতে চেয়েছে। কাম্পা নিজের বুদ্ধি বলে অনেকদিন পর্যন্ত সন্তানদেরকে আগলে রেখেছে,যত দিন না ওরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। লক্ষণীয়, নিপীড়িত দুর্বল শ্রেণীর প্রতিনিধি কাম্পা বুঝতে পেরেছে, যদি এইভাবে চলে তাহলে তাকে বার বারই শোষিত হতে হবে। তাই, টপ্পার তুলনায় কাম্পা নিতান্তই দুর্বল হয়েও তাকে পরাজিত করেছে। অন্যদিকে, কাম্পার মত দুর্বলের হাতে টপ্পার মত সবলের শোচনীয় এই পরাজয় আমরা লক্ষ্য করি।কিন্তু, টপ্পা কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে পারে না এই পরাজয়। আমরা জানি, উপকথার শেষে কোন না কোন উপদেশ থাকে। লক্ষনীয় বিষয়, কাম্পা আসলে নিপীড়িত ও দুর্বল শ্রেণীর প্রতিনিধি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্বলের হাতে সবলের অপদস্ত হতে হয়েছে। কারণ, প্রতারকদের এইভাবেই শাস্তি পেতে হয়। আর উপদেশের প্রসঙ্গে বলা যায়, সমাজে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিদেরকে চিহ্নিত করণ প্রক্রিয়া কাম্পা'ই করেছে। উপকথার প্রসঙ্গে বলা যায়,

> "পশু-পাখির চরিত্র অবলম্বন করে যেসব কাহিনি রচিত হয় তাকে সাধারণতঃ বাংলায় উপকথা বলে। কাহিনি গুলির দুটি উদ্দেশ্য- প্রথমতঃ কৌতুক রস সৃষ্টি ও দ্বিতীয়তঃ নীতি প্রচার। কাহিনিতে মানুষের চরিত্র গুলি পশু-পাখির ছদ্মবেশে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।"[৪]

লোককথায় গোষ্ঠীভুক্ত সমাজ জীবনে পরিবারের ভূমিকা খুব সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। লোককথার মূল উদ্দেশ্য, মানুষ। সমাজ জীবনে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের উপস্থিতি আমরা লক্ষ করতে পারি। ঠিক সেই ভাবে এক-একটি পরিবারের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অনটন ইত্যাদি লোককথার অন্যতম উপজীব্য বিষয়। নীতিকথা মূলক 'হিমা' গল্পে আমরা লক্ষ করতে পারি, মশা দম্পতির বৃদ্ধ বয়সের শেষ সম্বল তাদের একমাত্র পুত্র। সেই পুত্রকে তারা তাদের জীবন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়েছিলেন। কিন্তু পুত্র, সেই জ্ঞানতত্ত্বের মর্মার্থ যথাসময়ে প্রয়োগ করতে না পারার জন্যই তার জীবনে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে।

লোককথায় বন্ধু-বান্ধবী সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সম্পর্ক ভালোবাসার, রক্ত বহির্ভূত এই সম্পর্কে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ, জাত-পাতের কোন বিভেদ থাকেনা। তাছাড়া বিভিন্ন পশু-পাখি, জীব-জন্তু এমনকি কিছু বস্তুর মধ্যেও ঐ সম্পর্ক বিদ্যমান। এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে কখনো প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, ছদ্মবেশী কিংবা সন্দেহ প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য 'বাঁশের পাতা আর মাটির ঢেলা' নামক গল্পে লক্ষ্য করতে পারি, ওদের এমন এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, যে সম্পর্ক অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতির কাছে তারা নিরুপায়। ঝড় এবং বৃষ্টি নামক দুই প্রতারক তাদের বন্ধুত্বে চিরদিনের জন্য ছেদ ধরিয়ে দেয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী মৌখিক সাহিত্যে লোককথার সুবিশাল ঐতিহ্য বর্তমান। শিশুমনে এমনই এক আবেগ অনুভূতি জাগানো 'আকাশ' এবং 'ধানের খোসা' উপকথা কেন্দ্রিক গল্পে আমরা লক্ষ করতে পারি, শিশুমন ভাবতে থাকে আকাশ যদি ওদের কাছেই থাকত তাহলে কতই না ভালো হতো। ঠিক তেমনি, ধানের কোন খোসা ছিল না শুধুই গাছে চাল ধরত। কেন যে, সেই ভিখারিটা গাছের চাল চুরি করতে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোককথায় উপকথা কিংবা রূপকথার রাজ্যে শিশুমনে সেই ছবিই আঁকা হয়ে যায়, যেখানে তারা খুঁজে বেড়ায় আপন জগতকে—

> "শিশুর জীবনে কল্পনার প্রভাব অত্যধিক- কল্পনার মাধ্যমেই সে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতিকে রূপ দিবার চেষ্টা করে।"[৫]

শিশুরা লোককথার বৈশিষ্ট্য খোঁজার চেষ্টা করে না বরং তার চারপাশে আপন জগৎ খুঁজে বেড়ায়। অলৌকিক জন্মকথা কেন্দ্রিক 'মানুষের সৃষ্টি' নামক গল্পটি শিশু মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। হাঁসের ডিম থেকে মানব শিশুর জন্ম বৃত্তান্তের চিত্রপট তাদের মনকে দোলা দেয়। পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মধ্যেই তারা বিস্ময় খুঁজে। এক নতুন তরঙ্গে আন্দোলিত হতে থাকে তাদের মন, গল্পের শ্রোতারা অনায়েসেই এগিয়ে যায় কাল্পনিক জগতে। তাই বলা যেতে পারে,

> "লোক-কথা সজীব শিল্প, ইংরেজিতে ইহাকে Living Art বলা হইয়া থাকে। ইহা বলিবার মধ্যে যে রসসৃষ্টি হইয়া থাকে, শুনিবার মধ্যেও তেমনি একটি আনন্দের সৃষ্টি হয়।"[৬]

মানব চরিত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় 'আয়না না থাকা একটি গ্রামের কাহিনী' নামক গল্পে। বস্তুত লোককথা পরিণত মনের সৃষ্টি, এখানেই শিশুরা কৌতুহলী শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য,

> "আপাত দৃষ্টিতে লোক-কথা শিশু মনোরঞ্জনের জন্য রচিত বলিয়া মনে হইলেও, ইহা অপরিণত মনের সৃষ্টি

নহে। শিশু শ্রোতা, বয়স্ক ব্যক্তি ইহার রচয়িতা।"[৭]

উক্ত লোককথায় আমরা সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন সংগ্রামের সাথে সামাজিক মানুষের জীবনের কথা, তাদের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ পরিবেশের চিত্র পেয়ে থাকি। গল্পটি একান্ত বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জনিত। গল্পটির মূল উদ্দেশ্য সামাজিক মেলবন্ধন এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাদান। 'আয়না না থাকা একটি গ্রামের কাহিনী'র চরিত্র গুলোর যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয়, তা শিশু-কিশোরদের উৎসুক মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করে বিচিত্র আনন্দ দেয়। শিশু মন নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে। বস্তুত উক্ত গল্পে শিশু এবং কিশোর মনে একটা মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি তৈরি হয়ে যায়। আমরা জানি অধিকাংশ লোককথাই হাস্যরসাত্মক হয়ে থাকে। আবার-

> "প্রতিটি লোককথায় এক বা একাধিক মূল বিষয় বা অভিপ্রায় থাকে, একে বলা হয় মোটিফ। একটি লোককথা বিশ্লেষণ করলে আমরা সেই মূল বিষয়ের সন্ধান পাব, যেগুলি নিজস্ব স্বাধীন বৈশিষ্ট্য নিয়ে কালের প্রবাহের প্রতিকুলতাকে অতিক্রম করে টিকে থাকে, শুধু তাই নয় স্থান থেকে স্থানান্তরে পর্যটনও করে।"[৮]

লোককথা 'লোক মন' থেকেই উদ্বুদ্ধ তাই, লোককথায় মানব মনের নানা ইচ্ছা, নানা অধরা বস্তুকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। লোককথা মানব জীবনের দলিল। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, বিশ্বাস-সংস্কারের চিত্রপট গুলি লোককথায় চিত্রিত হয়েছে। লোককথার সমাপ্তিতে একটি বিশেষ উপদেশের কথা যেমন থাকে তেমনি শুরুর ক্ষেত্রেও একটা নির্দিষ্ট রীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- গ্রামের নামটি কেউ জানে না, এক যে ছিল রাজা, সে অনেককাল আগের কথা ইত্যাদি। লোককথার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বজনীনতা। তার মানে একই লোককথা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। বরাক উপত্যকার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোককথা গুলি পাঠান্তরের সাথে সাথে বিভিন্ন ভাষাতেও পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী, দুলাল সম্পাদিত, বাংলার লোক সংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪
২. পূর্বোক্ত, বাংলার লোক সংস্কৃতির বিশ্বকোষ, পৃ. ৪০
৩. করণ, সুধীর কুমার, বিশ্বলোককথা সমীক্ষা, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩০
৪. চক্রবর্তী ডক্টর বরুণকুমার, (সম্পাদিত), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৫৬
৫. চট্টোপাধ্যায়, প্রীতিভূষণ, শিক্ষায় মনোবিদ্যা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ১২, প্রথম সংস্করণ-১৯৬০, পৃ. ৫২৫
৬. ভট্টাচার্য্য শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোক-সাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৫৭, পৃ. ৩৮৯
৭. পূর্বোক্ত, বাংলার লোক সাহিত্য, পৃ. ৩৮৪
৮. চক্রবর্তী বরুণকুমার, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ষষ্ঠ পরিমার্জিত সংস্করণঃ জানুয়ারি-২০১০, পৃ. ৫০১

ঋণ স্বীকার :

১. শ্রীযুক্ত সুধন্য সিংহ
অবসরপ্রাপ্ত মেডিকেল কর্মী, নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের সদস্য। তাছাড়া বিষ্ণুপ্রিয়া

মণিপুরী বিভিন্ন কমিটির সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক হিসেবেও তার সুনাম সর্বজনবিদিত। ১৫টি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পাঠ্য পুস্তক প্রণেতা। 'আজুনি মণিপুরী প্রকাশনী' নামে একটি নিজস্ব প্রকাশনী আছে। তার অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। ঠিকানা : গ্রাম-কালিঞ্জর (অম্বিকাপুর -দ্বিতীয় খন্ড), পোস্ট অফিস- সিঙ্গারি, পিন কোড-৭৮৮০০৭, শিলচর, কাছাড়- আসাম, তথ্য সংগ্রহের তারিখ-৮ এবং ১৫ মে ২০২২

২. শ্রীযুক্ত বিনিন্দ্র সিংহ
প্রধান শিক্ষক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, গ্রাম-নরসিংহপুর, part-iii, পোস্ট অফিস- কাবুগঞ্জ (পাকইপার), পিন কোড- ৭৮৮১২২, জেলা-কাছাড়,আসাম ,তথ্য সংগ্রহের তারিখ-১লা জুন ২০২২

৩. শ্রীযুক্ত বিধান সিংহ
বিশিষ্ট সাহিত্যিক, (বাংলা ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী) বহু গ্রন্থের রচয়িতা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পাঠ্য পুস্তক প্রণেতা। চেয়ারম্যান, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী কলাক্ষেত্র (খম্পাল), পোস্টঅফিস- বেকীর পার, পিন কোড-৭৮৮১২৩, জেলা-কাছাড়, আসাম, তথ্য সংগ্রহের তারিখ-২২ মে ২০২২